WE
Vol 3 No. 1
June 2022

e-ISSN: 2583-2298

মাতৃত্বের বিনির্মাণ বিমল করের 'জননী' গল্পটি

(DECONSTRUCTION OF MOTHERHOOD IN BIMAL KAR'S 'JANANI')

Ruxana Khatun*

ABSTRACT

Motherhood is commonly portrayed as an idealistic concept of a mother who always sacrifices but never seeks from their child. She should not be imperfect. This image of a self-sacrificing 'ideal mother' created and perceived by family and society has been glorified in different literature, religious books, and even in current social media. Bimol Kar (1921) has looked into this concept of an ideal mother from a realistic angle in his short story 'Janani' (1962), which means 'mother' in Bengali. In 'Janani', he has uncovered a real being, i.e., a 'common and imperfect mother', from the envelope of an 'ideal mother'. His mother is as ordinary and imperfect as other human beings. This paper focuses on deconstructing the idealistic concept of motherhood from a realistic angle by analysing Bimol Kar's 'Janani' short story. Other literary sources have also been used in this paper to demonstrate and deconstruct the realistic depiction of motherhood. This study concludes that a mother should be considered as normal as other common individuals but not as an 'ideal' mother always. A mother cannot be an 'ideal mother' if she does not grow as a perfect human and woman being. A society should allow a woman to grow herself as a human being first instead of restricting her into a shell by glorifying them as an 'ideal mother'.

Keywords: *motherhood, humanity, feminity, deconstruction, short story, Bengali literature, Bimol Kar*

বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে গল্পকার হিসাবে সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করেন বিমল কর। প্রকাশিত প্রথম গল্প 'অম্বিকানাথের মুক্তি' (১৯৪৪)। (কর, ১৯৪৪) তাঁর অধিকাংশ লেখায় মৃত্যু চেতনা এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে। বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবই এ চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছে বলে মনে করেছেন বীরেন্দ্র দত্ত। সাহিত্যিকের সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যটি হল, 'যেহেতু মৃত্যুভাবনা বিমল করের লেখার বিষয়গত একটি প্রধান দিক, আবার যেহেতু বিমল কর একটা নির্দিষ্ট জীবন-বক্তব্যকে- প্রত্যক্ষ চিন্তায় বা পরোক্ষ সূত্রেই হোক - গল্পের সামগ্রিক ব্যঞ্জনায় রাখতে উৎসুক, তাই তাঁর প্রকাশভঙ্গিতে এক অদ্ভূত মৌলিকতা থেকে যায়।' (দত্ত, ২০০৩-২০০৪) (পৃষ্ঠা ৪০৩)। এই 'মৌলিকতার'ই অন্যতম দৃষ্টান্ত বহন করছে 'জননী' (১৯৬২) গল্পটি। (সিকদার, ২০০৬) 'জননী' গল্পটি বিমল করের এক অনবদ্য সৃষ্টি । মাতৃত্বের যে বিনির্মাণ তিনি এই গল্পে করেছেন তা অভিনব। জন্মদাত্রী জননী এখানে কোনও মহিমান্বিত, পুরাকথিত, প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠেনি। সর্বোপরি তাকে মানুষ হিসাবে উপস্থাপন করতেই লেখক অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য প্রকাশ করেছেন। জননীর যথার্থ প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় তার সন্তানের মধ্য দিয়ে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেখানে মাতৃ প্রতিমূর্তিটি হয়ে ওঠে মহিমান্বিত। সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায়, ধর্মগ্রন্থে ও বর্তমান সোশ্যাল মিডিয়ায় মাতৃসত্তাকে যেভাবে আদর্শায়িত করা হয় তাতে মনে হয়, মা যেন রক্তমাংসের মানুষের বাইরে অন্য কিছু। এরূপ আদর্শ ভাবমূর্তি চিত্রণের মধ্য দিয়ে মাতৃচরিত্রের ব্যক্তি সম্ভাবনাটি খর্ব হতে থাকে। চাওয়া পাওয়া নয়, শুধু দিয়ে যাওয়াই যেন তার নিয়তি হয়ে ওঠে। কথিত আছে কুপুত্র যদ্যপি হয় কুমাতা কখনো নয়। নারীর সমস্ত রকম সম্ভাবনাকে বেঁধে ফেলা হয় মাতৃত্বের মোড়কে। সুকুমারী ভট্টাচার্য 'প্রাচীন ভারতে মাতৃত্ব' প্রবন্ধটিতে দেখিয়েছেন 'শুধু যে মাতৃত্ব নারীর উপরে অনেক সময় আরোপিত হোতো, তাই নয়, তারা, নারীরা বাধ্য হতো মাতৃত্বকে তাদের জীবনের মূল তত্ত্ব হিসাবে গ্রহণ করতে।' (ভট্টাচার্য, ২০০৬) (পৃষ্ঠা ২৭) বাংলা সাহিত্যে মা ও মাতৃত্বের যে নির্মাণ আমরা পাই তার উপস্থাপনের পাশাপাশি বিমল করের 'জননী' গল্পে মাতৃত্বের বিনির্মাণের জায়গাটি আমরা বোঝার চেষ্টা করবো এই প্রবন্ধে।

মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে, বাস্তব ঘটনার ভিত্তিতে রচিত আনিসুল হকের বিখ্যাত উপন্যাস 'মা' (২০০৩) যেখানে অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের স্ত্রী সফিয়া বেগম স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহের প্রতিবাদে ঘর ছেড়েছেন নিজের নাবালক সন্তানকে নিয়ে।

*Independent Researcher and Former Guest Lecturer, Zakir Husain Delhi College & Zakir Husain Delhi College (Evening), University of Delhi, New Delhi – 110021, Email: ruxanak.du@gmail.com

© WE Faculty of Arts

(হক, ২০০৩) প্রতিকূল পরিবেশে দরিদ্রতার সঙ্গে লড়াই করে শেষ পর্যন্ত নিজের শেষ সম্বল সেই সন্তানকেই অনুমতি দিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধে শরিক হতে। সঙ্গী-সাথীদের নাম জানালে ছেলে ছাড়া পেয়ে যাবে, এ জানার পরেও মা ছেলেকে জেলে দেখা করতে গিয়ে বলেছে 'নাম বলবিনা'। ছেলে শেষ মূহুর্তে মায়ের কাছে ভাত চেয়েও ভাত খেতে পায়নি। এরপর যে বাকি চৌদ্দ বছর সফিয়া বেগম বেঁচে ছিলেন, তিনি আর অন্ন স্পর্শ করেননি। মৃত্যুর আগে বলে গিয়েছিলেন, তার কবরের ফলকে যেন লেখা হয় 'শহীদ আজাদের মা'। ধনী, অভিজাত ও ঢাকার বুকে সম্মানীয় স্বামীর পরিচয়ে নয়, নিজেকে পরিচিত করতে চেয়েছেন সন্তানের পরিচয়ে। মায়ের অসম্ভব, দৃঢ়, একনিষ্ঠ ও প্রবল ব্যক্তিত্ব এক্ষেত্রে যথার্থভাবেই প্রতিবিম্বিত হয়েছে সন্তান আজাদের মধ্য দিয়ে। তবে সে একদিনে হয়নি। মায়ের শেখানো বুলি নয়, মায়ের জীবনের যথার্থ সংঘর্ষের জমিনের আবাদেই ফলেছে আজাদের ব্যক্তিত্ব। বাবার সমস্তরকম বৈভব ছেড়ে আজাদ থেকেছে মায়ের সঙ্গে। মায়ের আদর্শ ও অসম্ভব লড়াকু মানুষিকতার কাছে শ্রদ্ধায় অবনত হয়েছে সন্তানের মস্তক।

এ তো গেল বাঙালির নিজস্ব মাটির রসদে গড়া সফিয়া বেগমের মতো ব্যক্তিত্বের মানুষের কথা যেখানে নারীর ব্যক্তিমননের বিকাশের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে 'জননী' সত্তা। অন্যদিকে রুশ সাহিত্যিক ম্যক্সিম গোর্কির সমাজবাস্তবতার প্রেক্ষিতে রচিত 'মা' (১৯০৬) উপন্যাসে উঠে এসেছে নীলভানার কাহিনী। এই উপন্যাসে দেখানো হয়েছে অত্যাচারিত, নির্যাতিত, নিরীহ ও অশিক্ষিত মা নীলভানা কীভাবে আত্মসচেতন ব্যক্তিত্বের অধিকারী ও রাজনৈতিক মা হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক সচেতনতায় সত্যানুসন্ধানী সন্তানের পথই হয়েছে মায়ের জীবনের চলার পথ। সন্তান পাভেল এবং সন্তানতুল্য নিকোলাই, আন্দ্রিও, আইভোনাচি ও রাইবিন গ্রেপ্তার হলে মা নীলভানা একদিকে যেমন ইস্তেহার বিলি করেছে শ্রমিকদের মধ্যে, তেমনই উপন্যাসের শেষে পাভেল এর দ্বীপান্তর হলে সন্তানদের আদালতে দেওয়া জবানবন্দী মায়ের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে প্রকাশ্যে জনসমক্ষে । পুলিশ মায়ের গলা টিপে ধরে তার কণ্ঠ রোধ করতে পারেনি, জনগণের উদ্দেশ্যে মা বলেই চলেছেন, 'মানুষ মেহেনত করে মরে; তার বদলে পায় কি? না – অভাব অনটন, খিদে, রোগ, চিরকাল ধরা বান্ধা মজুরি। সবকিছু আমাদের বিরুদ্ধে। দিনের পর দিন শেষ রক্তের ফোঁটা অবধি দিয়ে খাটি – আর থাকি আস্তাকুরে পড়ে, ওরা আমাদের বোকা মুখ্যু করে রেখে দেয়। আমাদেরই মেহনতের ফল ভোগ করে অন্যে। আর আমরা গলায় শেকল – বাঁধা কুকুরের মতো থাকি ওদের হাতের মুঠোয়। আমরা কিছু জানিনা, বুঝিনা - কেবল ভয়ে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে থাকি। ভয় করিনে হেন জিনিষ নেই। আমাদের জীবনটা একটা আস্ত আন্ধার রাত – আর কিছুই নয়।' (গোর্কি, ১৯৯৩) (পৃষ্ঠা ৩১০) মা পুলিশের অত্যাচার ও থাবার তলা থেকে তার সমস্ত সামর্থ্য নিয়ে চিৎকার করে বলতে থাকে 'এক হও, এক হও সব মানুষ, এক হয়ে এক বিরাট শক্তি গড়ে তোল।' (গোর্কি, ১৯৯৩) (পৃষ্ঠা ৩১১) এই মা নিজের জীবনের অধিকাংশ সময় অমানবিকভাবে অত্যাচারিত হয়েছে স্বামী মাইকেলের হাতে। সমাজের উঁচু স্তরের শোষণের ভয়ানক পরিণাম দৃশ্য হয়েছে নারীদের উপরে, আর এই অত্যাচারিত হয়ে যাওয়াকেই ভাবাদর্শ নির্ধারিত নিয়তি বলে মেনে নিত তারা। অত্যাচারিত স্ত্রী নীলভনা আর প্রতিবাদী দৃঢ়চেতা মা নীলভনার যে যাত্রা, সে যাত্রায় রয়েছে তার সন্তান ও সন্তাতুল্যদের কঠিন জীবন সংগ্রামের প্রভাব। রাশিয়ার জার বিপ্লবের প্রেক্ষিতে ১৯০৬ সালে প্রকাশিত ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা' উপন্যাসটির প্রভাব পড়েছে ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষিতে রচিত আনিসুল হকের 'মা' (২০০৩) উপন্যাসটিতে। ম্যক্সিম গোর্কির উপন্যাসে সন্তানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছে মা, আর আনিসুল হকের উপন্যাসে 'মা' এর প্রবল ব্যক্তিত্বের আলোকে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষিতে আদর্শায়িত হয়েছে সন্তানের ব্যক্তিত্ব। মা ও সন্তানের নানাবিধ যৌথ সংগ্রামে বিকশিত হয়েছে তাদের ব্যক্তিত্ব - যার ফলে মাতৃভূমি পেয়েছে তাদের সুযোগ্য সন্তানদের যারা দশের কাজে আত্মাহুতি দিয়ে দেশ ও দেশবাসীকে করেছে ঋদ্ধ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সেই বীর যোদ্ধাদের নিয়ে লেখা হুমায়ুন আহমেদের 'জ্যোছনা ও জননী' (২০০৪) উপন্যাসে তাই দেখি সেখানে দেশমা পরম লালিত্যে 'জ্যোৎস্নার রাতে বীর সন্তানদের কবরে অপূর্ব নকশা তৈরি করছে। আর গভীর বেদনার সঙ্গে বলে আহারে আহারে।' (আহমেদ, ২০০৪)

ব্যক্তি, রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারের ঘাত-প্রতিঘাতে নির্মিত এই জননীসত্তার বাইরেও তো আমরা মায়েদের পাই, নারীদের পাই, যেখানে সন্তানসম ভুবন বলেছিল 'মাসি ! তুমিই আমার এই ফাঁসির কারণ। যখন আমি প্রথম চুরি করিয়াছিলাম, তুমি জানিতে পারিয়াছিলে। সেসময়ে যদি তুমি শাসন ও নিবারণ করিতে, তাহা হইলে আমার এ'দশা ঘটিতনা'।

(বন্দ্যোপাধ্যায় (বিদ্যাসাগর), ১৮৫৫) মহাশ্বেতা দেবী 'স্তনদায়িনী' (১৯৯৭) গল্পে বলেছেন 'ভারতের মাটির গুণ এমনি যে এইখানে রমণীরা সবাই জননী হইয়ে যায় এবং পুরুষেরা গোপাল ভাবে আপ্লুত থাকে'। (দেবী, ১৯৯৭) অর্থাৎ জননীভাব এ মাটির সহজাতভাব। পেট চালাতে খুব সহজভাবেই যশোদা হয়ে ওঠে পেশাদারী মা। বাবুবাড়ির সন্তানদের নিজের স্তনের দুধ খাওয়ায় যশোদা। সাকুল্যে নিজের ও পালিত মিলিয়ে পঞ্চাশ সন্তানের স্তনদায়িনী, সাধ্বী স্ত্রী সে। তবে শেষ জীবনে স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত মৃত যশোদার পাশে কেউই থাকেনা। হাসপাতালের ডাক্তার আর ডোমের হাতে শেষ কৃত সম্পন্ন হয় তার। লেখিকা খুব সচেতনভাবে গল্পটির নামকরণ করেছেন। যশোদা যেন শুধুই স্তনদাত্রী, সন্তানের মা নয়, কারণ সন্তান ও মায়ের যৌথ ভূমিকায় সম্পন্ন হয় জননীর গঠন। তাই লেখিকা যেন খুব বাস্তবতার সাথেই আমাদের বুঝিয়ে দিলেন জন্ম দেওয়া জৈবিক সহজাত প্রক্রিয়া হলেও মাতৃত্ব ও জননীর পদ হবে আত্মসচেতনতায় দৃপ্ত। তবে যশোদারা পুঁজিবাদের শিকার, তার স্তনের দুধ ধন ও ধনীর পণ্য । তেমনই মহাশ্বেতা দেবীর অপর এক গল্পে অসহায় নিরাপত্তাহীন এক নারী নিজের ও নিজের সন্তানের জীবনধারণের তাগিদে নিজের সন্তানের কাছেই হয়ে উঠেছিল 'সাঁঝ সকালের মা' (১৯৯৭)। (দেবী, ১৯৯৭) মা, জ্যোতি সন্তান সাধনকে বুঝিয়েছিল সে শুধু সকাল আর সন্ধ্যায় ডাকবে 'মা' বলে, অন্য সময় তার মা, জ্যোতি ঠাকুরানী । মৃতপ্রায় মায়ের কাছে সাধন তাই প্রশ্ন করেছিল 'এখন সে তার কে?'

উপরিউক্ত প্রেক্ষিতে এখানে একটাই প্রশ্ন, নারী মননের বিকাশ না হলে কি 'জননী' সত্তার বিকাশ হতে পারে ? কিছু জননীর আত্মত্যাগের প্রতিমূর্তির আলোকে আমরা জননীদের ত্যাগ তিতিক্ষার প্রতিমূর্তি রূপে উপস্থাপিত করতে গিয়ে কি তাদের রক্ত-মাংসের মানুষ হওয়ার দিকটি বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছেনা ? এই প্রশ্নের আলোকেই দেখা যেতে পারে বিমল করের 'জননী' গল্পটি।

গল্পটিতে সাহিত্যিক বিমল কর সচেতনভাবে মানুষ হিসাবে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন 'জননী' সত্তাকে। 'জননীর' বাইরে তাই মানুষ ও চরিত্র হিসাবেই অধিক প্রাধান্য পেয়েছে এই সত্তাটি। গল্পটি শুরু হয়েছে এইভাবে, 'আমরা পাঁচ ভাইবোন, বাবা বলত আমরা মায়ের হাতের পাঁচ আঙ্গুল।' একজন নারীর জীবনের সার্থকতা ও সম্পূর্ণতা খোঁজা হয় তার জননী সত্তার মধ্য দিয়ে। গল্পে জননীর কমবয়সের প্রথম সন্তান গল্প কথকের বড়দা - ঠাকুমা বলতেন 'এত রূপ নিয়ে যখন জন্মালি ভাই মেয়ে হয়ে জন্মালিনা কেন?' পিতৃতান্ত্রিকতার ধারক ও বাহক হিসাবে বিগত প্রজন্মের জননীর এ স্বরূপ ব্যখ্যার বিশেষ প্রয়োজন হয়না। সাধারণত এ সমাজে পুরুষের রূপের প্রয়োজন সেভাবে পড়েনা যতটা নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সাহিত্যে, বিশেষত কাব্য ও কবিতায়, নারীর রূপ-কেন্দ্রিক যে স্তুতি তার নির্মম পরিণতি ভোগ করে চলেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্ত্রীর পত্র' (১৩২১ বঙ্গাব্দ) গল্পের রূপহীন বিন্দুরা। (ঠাকুর, ১৩২১ বঙ্গাব্দ) এ সূত্রেই উল্লেখ করা যেতে পারে 'জননী' গল্পে মা এর আকুতির দিকটি। বড়ো ছেলে বন্ধুর কাঙ্ক্ষিত নারীকে বিয়ে করতে না চাইলে মা বলেছে 'কনক কতো সুন্দর বলতো, ওকে বিয়ে করলে বংশধরেরা কতো সুন্দর হবে।' শুধু রূপ নয়, বর্তমান সামাজিক চাহিদার কাঠামো দশভূজারূপে যেভাবে নারীকে পেতে চায় এবং পরবর্তীতে জননীর মোড়কে যেভাবে তাকে ত্যাগ তিতিক্ষার প্রতিমূর্তি করে তুলতে চায় তাতে সম্পূর্ণভাবে এই কাঠামো অস্বীকার করে নেয় ওই নারীর ব্যক্তি সত্তাকে । বিমল কর প্রথাগত এই মাতৃসত্তার বিনির্মাণ করেছেন 'জননী' গল্পটিতে। মা, তিনি ভীষণভাবে ত্রুটিযুক্ত আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতোই একজন মানুষ। গল্পে তিনি জননী শ্রেণীভুক্ত আদর্শের মোড়কে উপস্থাপিত কোন বিশিষ্ট সংজ্ঞায়িত, শ্রেণী চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করেননি। গল্পে সচেতন শিল্পী নিপুণভাবে নারী ও মাতৃত্বের মোড়ক থেকে রক্ত-মাংসের মানুষকে বের করে এনেছেন। অসাধারণ সুন্দরী মানুষটির রূপ যেমন প্রতিবিম্বিত হয়েছে তার সন্তানের মধ্য দিয়ে, তেমনই মাতৃত্বের খোলসের ভিতরের মানুষটির চিত্রও প্রতিফলিত হয়েছে তার সন্তানদের ভাবচিন্তনের মধ্য দিয়েই। মায়ের মৃত্যু ও শ্রাদ্ধের অন্তে তাই একে একে পাঁচ সন্তানের মনের দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়েছে 'জননীর' মোড়কে ত্রটিযুক্ত মানুষটির চিত্র। কথাসাহিত্যিক বিমল করের 'ইঁদুর' গল্পের আলোচনায় তপোধীর ভট্টাচার্যের বলার মতো করে 'মোহনায় দাঁড়িয়ে উৎসের দিকে দৃষ্টি ফেরানোর মতো করে' (ভট্টাচার্য, ২০১৭) (পৃষ্ঠা ৩৫৫) জননীর পাঁচ সন্তান তাদের জননীর জীবনপ্রবাহকে দেখেছেন। চৈত্র মাসে মায়ের শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেলে বাগানের যে অংশে মাকে দাহ করা হয়েছিল, সেখানে একটি বাঁধানো বেদিতে মাসান্তে তারা এসে বসেছে। মহাভারতের প্রস্থান পর্বের আদলে তারা তাদের মায়ের স্বর্গের পথে যাত্রা কল্পনা করেছে।

© WE Faculty of Arts

জননীর মর্ত্য থেকে স্বর্গপথ যাত্রার কষ্ট লাঘব করার জন্য মাকে তারা কী দিতে পারে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে তারা মোহনা থেকে দৃষ্টি চাড়িয়েছে উৎসের পথে - মায়ের সঙ্গে তাদের জীবনের গতি প্রবাহে। আর সেই জীবনের চড়াই উৎরাই এর প্রবাহে উঠে এসেছে এক মানুষ, জননীর ভিতরে সহবস্থানকারী এক অতীব সাধারণ মানুষ।

রাঁচির দিকে মুন্ডা না মুন্ডারীদের গ্রামে এক বাড়িতে গল্প কথকের মেজদা দীনু একটি ছবি দেখেছিল। মাটির বাড়ির বাইরের দেওয়ালে রঙ গুলে আঁকা একটা বাচ্চা ছেলের ছবি, ঘোড়ায় চড়া সেই ছেলের এক হাতে লাঠি, অন্য হাতে লাগাম, কাঁধে খাবারের পুঁটুলি, মাথায় তেষ্টা মেটাবার জন্য জলের ঘটি । এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে গল্পকার বিমল কর এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন উপরিউক্ত এই ধরণের সংস্কারই তাঁকে গল্পটি লিখতে অনুপ্রাণিত করেছে । শ্মশানের বাইরে আলাদা করে সাথী-সঙ্গীহীনভাবে মাকে তারা স্থাপন করেছে বাড়ির বাগানে। তার একাকীত্বের পাথেয় হিসাবে উক্ত ছবির অনুরূপে তারা মর্ত্য ও স্বর্গের পথ অতিক্রম করার পাথেয় হিসাবে কী কী দিতে চেয়েছে দেখে নেওয়া যেতে পারে, - 'বড় ছেলে মাকে দিতে চেয়েছে 'ভালোবাসার মন'।' মা বড় ছেলের বিবাহ দিতে চেয়েছিলেন অপরূপ সুন্দরী কনকের সঙ্গে, বন্ধু অরূপ ভালোবাসে মেয়েটিকে, সেই ভালোবাসার কথা মাকে জানালে মা বলেছিলেন 'কিন্তু কনক যে অপরূপ সুন্দরী, এই মেয়ে ঘরে এলে আমার বংশধরেরা কতো সুন্দর হবে ভেবে দেখ ।' বড়দা বলেছে 'আমি সৌন্দর্য ভালোবাসি কিন্তু ভালোবাসা আরও বেশী ভালোবাসি।' আর সেই ভালোবাসা ভরা মনই সে তার মাকে দিতে চেয়েছে। বড়ো মেয়ে অনুপমা, স্বামীর রোগ, নোংরামি ছেড়ে বাপের বাড়ি আশ্রয় নেওয়ার দিকটি মা কোন মতেই সমর্থন করে নি। বাবাকেও মা নানাভাবে বোঝাতে চেয়েছে মেয়ের সিদ্ধান্তের ত্রুটির দিকটি। মেয়ের যন্ত্রণার প্রতি সহমর্মী না হয়ে বলেছিলেন 'এ বাড়ির মর্যাদা নষ্ট হোক এমন কোন কাজ করতে আমি তোমাকে দেবো না।' অনুপমার মায়ের প্রতি ক্ষোভ ছিল 'রোগ, নোংরামি, কষ্ট, সব সহ্য করি তাতে তোমার আপত্তি নেই ; আপত্তি সুখ পাবার ব্যবস্থা করতে।' বড় মেয়ে মায়ের মধ্যে লক্ষ্য করেছে উচিত সাহসের অভাব। তাই পাথেয় হিসাবে দিতে চেয়েছে উচিত সাহস। ছোট মেয়ে নিরুপমা শয্যাশায়ী, ডাক্তারের কথামতো কম বয়সেই অতিরিক্ত পরিশ্রমে নিজের জীবনীশক্তির অনেকখানি ক্ষয় করে ফেলেছে। সেসময় বন্ধুর মতো আশা-ভরসা জুগিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছিল সুশান্ত। সুশান্তকে মা বলেছিল 'তুমি ডাক্তার নও, অযথা ওকে বিরক্ত করোনা'। তারপর থেকে সুশান্ত আর বাড়িতে পা রাখেনি। নিরুপমার কথায় 'মা আমার অসুখটাই দেখেছিল, সুখ দেখেনি। মা জানত না, জগতে সব রোগ কেবল ডাক্তার দিয়ে সারানো যায় না। আশা পাওয়া অনেক, ভরসা পাওয়ার কতো শক্তি।' নিরুপমা সেই ভরসা মা কে দিতে চেয়েছে । কথক ওরফে ছোট সন্তান কড়ি মাকে দিতে চেয়েছে স্বার্থ ত্যাগের ক্ষমতা। কড়ি দেখেছে সময়ের বিপাকে পড়া নিরুপায় অসহায় শচী জ্যাঠাকে কীভাবে মাত্র দু'শো টাকার নোট ধরিয়ে দিয়ে ব্যবসার পুরনো অংশীদারি বাতিল করিয়ে নিয়েছিল। মা বলেছিল 'ওই ব্যবসা অন্যের তদারকিতে দেওয়া আছে, বছরে হাজার দুয়েক টাকা বাড়িতে আসে, টাকাটা আমি অকারণে খোয়াব। অতও স্বার্থ ত্যাগ আমি শিখিনি।' অন্ধ মেজদা মাকে দিতে চেয়েছে হৃদয়ের চক্ষু। তার ভাবনায়, 'আমাকে যেমন একটা নির্বোধ সুটকেশঅলা অন্ধ করে দিয়ে গেল, তেমনি মা কে এই সংসারের শনিতে অন্ধ করেছিল। মা যে কতো অন্ধ আমি জানতাম। ... এই অন্ধ চোখ মা কে আর দিতে ইচ্ছে করেনা, মা আমার হৃদয়ের চক্ষু পাক।' প্রাবন্ধিক সুস্নাত জানা উক্ত উক্তিটির মধ্যে লক্ষ্য করেছেন পূর্বোক্ত চার সন্তানের অভিব্যক্তিতে 'মা চরিত্রের যে অভাব তাদের চোখে ধরা পড়েছে, যেন তার সঙ্গত যুক্তি দিয়ে মাকে অপবাদ মুক্ত করা হল।' (জানা, ২০১৮) (পৃষ্ঠা ৯৯৭)

সন্তানেরা তাদের মাকে মৃত্যু পরবর্তী পথ চলার পুঁজি হিসাবে ভালোবাসার মন, উচিত সাহস, ভরসা, স্বার্থ ত্যাগের শিক্ষা ও হৃদয়ের চক্ষু দিতে চেয়েছে। গল্পকার এই গল্পের মাধ্যমে খুব সূক্ষ্মভাবে সাহিত্যিক ঢঙে সমাজকে এক তীব্র অথচ সূক্ষ্ম আক্রমণ করে গেলেন ; তা হল, এই পাথেয়গুলি যেকোন মানুষের জীবনে চলার পথে অপরিহার্য। যেকোনো মানুষের চরিত্র গঠনে সার্বিক ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবার। এই তিন এর ভূমিকায় সমাজে ব্যক্তি-চরিত্রের বিকাশ হয়। কন্যা, নারী ও মাতৃত্বের বিকাশ যে সমাজ কাঠামোয় হয় সেখানে নানাস্তরে বঞ্চনার স্বীকার হয়ে যেতে হয় তাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাকে এগিয়ে যেতে হয় নানান বাধা, প্রতিকূলতা ও অপ্রাপ্তির মধ্য দিয়ে। যার ফলে অধিকাংশ নারীর পূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়ে ওঠে আকাশ কুসুম কল্পনার মতো। প্রতিমুহূর্তে যার বিকাশ হয়েছে অপ্রাপ্তির মধ্যে,

©WE-Faculty of Arts

বাধার মধ্যে, উদারতা তার ক্ষেত্রে মিথের মতোই সত্য। মেজদার কথাটি এখানে তাই ভীষণভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে, 'মা কে এই সংসারের শনিতে অন্ধ করেছিল।' অথচ পরবর্তী সময়ে 'জননীর' মোড়কে এই নারীদেরই ত্যাগ তিতিক্ষার প্রতিমূর্তি করে তুলতে রচনা করা হয় বহুস্তরীয় বয়ানের। 'জননী' (১৯৩৫) উপন্যাসকার মার্ক্সীয় ভাবধারায় আস্থাশীল মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক আগেই এই সত্যটি অনুধাবন করে গেছেন। (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৩৫) তাই উপন্যাসের প্রধানতম চরিত্র জননী শ্যামার আকস্মিক মাতৃত্বের কোন বিকাশ তিনি দেখাননি। মাতৃত্বের বিকাশের ইঙ্গিতের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে পরবর্তী প্রজন্মের আগমনের। বড় ছেলে বিধানের, প্রথম সন্তান জন্মানোর মধ্য দিয়ে নারী ও মাতৃত্বের যে যাত্রা তা যেন অনেকাংশে এক মানুষ, এক নারী ও এক জননী সত্তার যাত্রা হয়ে উঠেছে, এ যাত্রা কোন মহিমান্বিত মাতৃত্বের নয়। পুত্রবধূর সুখী হওয়ার চিত্র ক্রমাগত বিচলিত করেছে যে শ্যামাকে, সেই শ্যামাই যখন সন্তান-সম্ভবা পুত্রবধূ সুবর্ণকে দেখে, তখন কথাকার দেখিয়েছেন 'কোথায় গেল ক্ষুদ্র বিদ্বেষ, শত্রুতা সুবর্ণের জীবন লইয়া শ্যামা যেন বাঁচিয়া লইল। তারপর এক চৈত্রের নিশায় এ বাড়ির যে ঘরে শ্যামা একদিন বিধানকে জন্ম দিয়েছিল ..... সেই ঘরে শ্যামার কোলে স্পন্দিত হইতে লাগিল জীবন।' তাই 'জননী' গল্পের ও উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায় নারী থেকে জননীর যাত্রা আকস্মিক সহজাত নয়, জন্মসূত্রে সহজভাবে তা আসেনা, তা অর্জন করতে হয়। নারী ব্যক্তিত্বের বিকাশ না হলে মাতৃত্বের আশানুরূপ বিকাশ সম্ভবপর নয়।

তথ্যসূত্র

অশ্রুকুমার সিকদার (২০০৬). *বাংলা গল্প সাংকলন,* ১ম ও ২য় খণ্ড. নিউ দিল্লী : সাহিত্য আকাদেমি.

আনিসুল হক (২০০৩). *মা .* ঢাকা : সময় প্রকাশনী.

ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (বিদ্যাসাগর) (১৮৫৫). *বর্ণ পরিচয়,* দ্বিতীয় ভাগ, দশম পাঠ, 'চুরি করা কদাচ উচিত নয়' . কলকাতা : প্রবোধচন্দ্র মজুমদার এন্ড ব্রাদার্স.

তপোধীর ভট্টাচার্য (২০১৭). *ছোট গল্পের সুলুক সন্ধান (উত্তরার্ধ).* কলকাতা : দেজ পাবলিশিং.

বিমল কর (১৯৪৪). *অম্বিকানাথের মুক্তি .* কলকাতা : প্রবর্তন পত্রিকা.

বীরেন্দ্র দত্ত (২০০৩-২০০৪). *বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ* (দ্বিতীয় খণ্ড), ৫ম সংস্করণ . কলকাতা : পুস্তক বিপণি.

মহাশ্বেতা দেবী (১৯৯৭). *স্তন দায়িনী এবং অন্যান্য গল্প.* কলকাতা : করুণা প্রকাশনা.

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৫). *জননী .* কলকাতা : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সনস.

ম্যাকসিম গোর্কি (১৯০৬). *মা* (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), অনুবাদ: পুষ্পময়ী বসু, ২য় সংস্করণ (১৯৯৩) . কলকাতা : এন বি এ.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩২১ বঙ্গাব্দ). *স্ত্রীর পত্র .* কলকাতা : সবুজ পত্র.

সুকুমারী ভট্টাচার্য (২০০৬). *প্রাচীন ভারতে মাতৃত্ব,* মূল উৎস: *'প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ'* (ভাষান্তর - বিজয়া গোস্বামী, নীলাঞ্জনা শিকদার দত্ত ও করুণা সিন্ধু দাশ). কলকাতা : এন বি এ.

সুস্নাত জানা (২০১৮). *জননী...এক অনুভবী গাথা,* উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (সম্পা.) 'গল্পচর্চা' (৩য় সংস্করণ). কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ.

হুমায়ুন আহমেদ (২০০৪). *জোছনা ও জননীর গল্প.* ঢাকা : অন্যপ্রকাশ.

©WE-Faculty of Arts